MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

লুটপাট থেকে লোপাটের গল্প

সত্য নাকি বিস্ময়ের চেয়েও শক্তিশালী। তাই কিছু কিছু বিষয় যেন বিস্ময়কেও হার মানায়। যেমন, সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারবেন, তিরিশ হাজার কোটি টাকা মানে কত টাকা? মাসে যদি কেউ এক লাখ টাকা করে সঞ্চয় করেন তাহলে এক কোটি টাকা সঞ্চয় করতে লাগবে ৮ বছর। এক লাখ টাকা আয় করতে পারেন এরকম মানুষ কতজন আছে দেশে আর এক লাখ টাকা মাসে সঞ্চয় করতে পারেন এরকম আয়ের মানুষ কতজন? তারপরও যদি তাঁরা সঞ্চয় করতে থাকেন তাহলে ব্যাংকের মুনাফা পেয়ে কমপক্ষে ২ লাখ বছর লাগবে তিরিশ হাজার কোটি টাকা ব্যাংকে জমাতে। আর তিরিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে গেল ব্যাংক থেকে তেমন কোন কাগজপত্র না দেখিয়ে বা ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে! এও সম্ভব?

এই টাকা জনগণের জন্য ব্যয় করা হলে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে ৮ হাজার কোটি টাকার বাড়তি বোঝা জনগণের কাধে চাপানো, সারের দাম বাড়ানো, তেলের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতো না। আর ডলারের অঙ্কে এর পরিমাণ প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার। সাড়ে তিন বছরে অর্থাৎ ৪২ মাসে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য আইএমএফ এর প্রতিনিধি দলের কতই না জবাবদিহি আর শর্ত আমরা দেখলাম। আবার পদ্মা সেতু নিয়ে আবেগ অহংকার, গর্ব শাসক দল ও তাদের সমর্থক এবং পদ্মা পাড়ের জনগণের সেটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। সেই সময়েই খবর এলো এস আলম গ্রুপ নাকি ইসলামি ব্যাংক থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে গিয়েছে। এস আলমের এই টাকা প্রায় পদ্মা সেতু নির্মাণের মোট খরচের সমান। পদ্মা সেতু করা নিয়ে শাসক দল ও তার সমর্থকদের যত আনন্দ-উল্লাস কিন্তু সেই একই পরিমাণ অর্থের লুটপাট নিয়ে কোন দুঃখ-বেদনা, লজ্জা-গ্লানি নেই! কেন এমন হলো বা হচ্ছে?

ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত না দেওয়া বাংলাদেশে কি খুব সহজ? একের পর এক ঘটনায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যাংক থেকে ঋণের নামে টাকা বের করে নেওয়ার পদ্ধতি খুবই সহজ। এজন্য প্রথম কাজ হলো ক্ষমতার সঙ্গে থাকা। রাজনৈতিক সম্পর্ক ব্যবহার করার দক্ষতা লাগবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মালিক পক্ষ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িতদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে ভুয়া ঠিকানায় কাগুজে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ঋণ নেওয়া। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পর্কগুলো যত প্রভাবশালী হবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ততই চুপচাপ থাকবে। নিশ্চয়ই মনে আছে কীভাবে প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদার নামে-বেনামে অনেকগুলো কোম্পানি খুলে তারপরই দখল করেছিলেন একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রশান্ত হালদার কিন্তু এই পদ্ধতির জনক ছিলেন না। তিনি শিখেছিলেন আরেক বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের প্রধানের কাছ থেকে। আবার ব্যবসায়ী গ্রুপের সেই প্রধান শিখেছিলেন দেশের ব্যবসায়ী নেতার কাছ থেকে। এ পদ্ধতিতে কোম্পানি খুলে শেয়ারবাজার থেকে অর্থ তুলে নেওয়া হয়েছে অতীতে।

একসময় দেখা যেত ব্যবসায়ীরা নিজের কোম্পানির নামে ব্যাংক থেকে ইচ্ছেমতো ঋণ নিতেন। তাতে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপুল পরিমাণ ঋণ চলে যেত। কোনো একক প্রতিষ্ঠানের কাছে যাতে বেশি ঋণ চলে না যায়, এজন্য ঋণ নেওয়ার সীমা আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু সহজে টাকা পাওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ তো নিতেই হবে। তাই শুরু হয় অন্যের নামে, ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া।

আবার অনেকে কোম্পানি না খুলে শুধু ট্রেডিং লাইসেন্স নিয়েই ব্যবসা করছেন। ব্যাংক থেকে তুলে নিচ্ছেন টাকা এবং সেই টাকা ব্যাংকে ফেরতও দিচ্ছেন না। এমন প্রথা বেশ পুরনো এবং চলেছে বহু দিন। সাবেক ওরিয়েন্টাল ব্যাংকও প্রায় ধ্বংসের পথে গিয়েছিল এসব কারণেই। একেকটা ঘটনা ঘটে আলোড়ন তৈরি হয়, প্রশ্ন ওঠে, কেন ভুয়া নাম ও ঠিকানা ব্যবহার করে ঋণ নেওয়া বন্ধ হচ্ছে না। কমছে না খেলাপি ঋণের পরিমাণ আর এসব দেখার এবং ঠেকানোর দায়িত্ব কার? অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, যখন ব্যাংকের মালিক পক্ষ ভুয়া কোম্পানির নামে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, তখন তা ঠেকানো কঠিন। কারণ, ব্যাংক কর্মকর্তারা চাকরি হারানোর ভয়ে মালিকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথাযথ নজরদারি ও সদিচ্ছা

থাকে, তাহলেই আমানতকারীদের অর্থের সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। তবে কি এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি কম? যে কারণে আমানতকারীদের অর্থের সুরক্ষা সেভাবে দেওয়া যাচ্ছে না।

২০১১ সালে ব্যাপক আলোচনায় এসেছিল হলমার্ক কেলেঙ্কারি। কেলেঙ্কারির দায় না নিয়ে সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির বিবেচনায় ৪ হাজার কোটি টাকা কিছুই নয়। সে সময় দেখা গিয়েছিল হলমার্ক গ্রুপ সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা আত্মসাৎ করতে যেসব কোম্পানির নাম ব্যবহার করে, তার কয়েকটি ছিল কাগজ নির্ভর। অর্থাৎ এসব কোম্পানির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এর ফলে সোনালী ব্যাংকের লোকসান হয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। যার পুরোটাই এখন খেলাপি। সোনালি ব্যাংক কি সেই ধাক্কা এখনো কাটিয়ে উঠতে পেরেছে?

এরপর খবর বের হয় ২০১৪-১৫ সালে অ্যানন টেক্স গ্রুপ জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণের নামে নিয়ে গিয়েছে। এই পরিমাণ ঋণ নেওয়ার জন্য ২২টি প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে গ্রুপটি। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত কিংবা পরিদর্শনে দেখা যায়, এদের মধ্যে মাত্র চারটি কোম্পানি ছিল পূর্ণাঙ্গ। অনেকগুলোই কাগুজে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব কোম্পানির মালিক বানানো হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। কি কারবার! ফলে যা হওয়ার তাই হলো। এসব ঋণের বড় অংশ এখন খেলাপি। আর এই ঋণের কারণে জনতা ব্যাংক এখন ঋণখেলাপিতে শীর্ষে।

শুধু সরকারি ব্যাংক নয়, বেসরকারি খাতের ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংকে ভল্ট কেলেঙ্কারির ঋণেও বড় অনিয়ম ধরা পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিদর্শনে দেখতে পায় যে, শুধু ট্রেড লাইসেন্সের ভিত্তিতে কোম্পানি খুলে ঋণের বড় অংশই নিয়ে নিয়েছে প্রায় ৩০০ প্রতিষ্ঠান। তাজ্জবের ব্যাপার হলো, অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো ট্রেড লাইসেন্সও ছিল না। কাগুজে এসব কোম্পানিকে দেওয়া ঋণের বেশির ভাগেরই খোঁজ মিলছে না এখন। ঋণ গ্রহীতা নেই, ফলে এসব ঋণ আদায়ও হচ্ছে না।

ইউনিয়ন ব্যাংকের বিতরণ করা ঋণের ১৮ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা খেলাপি হওয়ার যোগ্য বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল, যা ছিল ব্যাংকটির মোট ঋণের ৯৫ শতাংশ। একইভাবে সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংকেও বড় অনিয়ম পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ব্যাংক দুটি এখনো এসব ঋণখেলাপি বলে ঘোষণা করেনি। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে ও পুনঃতফসিল করে ঋণগুলো নিয়মিত দেখাচ্ছে ব্যাংক দুটি। তাতে ব্যাংকের ইমেজ ও আমানত কোনোটাই কি রক্ষা পাবে?

একই ধরনের ঘটনা ধরা পড়ল এবার ইসলামি ব্যাংকে। ব্যাংক থেকে যেসব প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ঘটনাটা এক দিনে ঘটেনি। এমন ঋণ দেওয়া শুরু করেছিল চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ শাখা থেকে। দেখা গেছে, ব্যাংকটির যেসব কর্মকর্তা এই ঋণ প্রদানে সহায়তা করেছেন, তাদের দ্রুত পদোন্নতি হয়েছে। এবং তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ঋণ-সংক্রান্ত বিভাগগুলোতে। ফলে সহজেই বণ্টন করা হয়েছে ভুয়া ঋণ। এসব ঋণের মেয়াদ দেওয়া হয়েছে বেশি, যাতে সহজেই ঋণখেলাপি না হয়। ভুয়া কোম্পানি খুলে শুধু ঋণ দেওয়া নেওয়া নয়, দেশের কয়েকটি ব্যাংক দখলের সময়ও এমন কিছু কোম্পানির নাম ব্যবহার হয়েছিল, যাদের সঠিক পরিচয় ছিল না।

বাংলাদেশ ব্যাংক যদি উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন ভালো ব্যাংকগুলো, যাদের আমানত বেশি সেগুলো আক্রান্ত হবে এবং এটাই ঘটছে। পত্রপত্রিকায় নাম আসছে যে, একজন ব্যক্তি ও তার পরিবার ব্যাংক খাতকে বড় ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। এটা যে অর্থনীতির জন্য কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে সরকার কি তা বুঝে না? তাহলে কেন চুপ করে ছিল, প্রতিকারের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না কেন? নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও দুর্নীতি দমন সংস্থা আর কত দিন চোখ বন্ধ রাখবে বা দেখতে চাইবে না? রেমিট্যান্সের মাধ্যমে যে ডলার আয় হয়, তা ব্যাংক মালিকদের কোম্পানির আমদানিতে খরচ করতেই যদি শেষ হয়ে যায়, অন্য কেউ যদি ব্যবসা করার সুযোগ না পায় তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে? পুরো ভোগ্যপণ্যের বাজার যদি এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তাহলে দেশটা জিম্মি হয়ে পড়বে এদের হাতে। যার বিষময় ফল এরই মধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন দেশবাসী।

ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়ার এবারের ঘটনাটা অনেক বড়। ইসলামি ব্যাংক থেকে এস আলমের ৩০ হাজার কোটি টাকার অধিক লোপাটের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরও এটা মনে করা স্বাভাবিক যে এই ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এবং আতঙ্কের সঙ্গে ভাবতে হবে এটাই শেষ নয়। সেই গল্পটা তো মনে আছে।

কুমির তার বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতে দিয়েছিল শিয়ালের কাছে। শিয়াল-কুমিরের ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলেছিল। প্রতিশোধের আশায় ক্রুদ্ধ কুমির এক দিন ধরে ফেলেছিল শিয়ালকে। শিয়ালের পা ধরে টেনে নেওয়ার সময় ধূর্ত শেয়াল চিৎকার করে ওঠে ওরে আমার লাঠি ছাড়, তুই তো আমার লাঠি ধরেছিস। সরল কুমির ভাবে, সে হয়তো শিয়ালের পায়ের বদলে লাঠি ধরেছে। তাই দ্রুত পা ছেড়ে দিয়ে পা মনে করে লাঠিটাকেই ধরে ফেলে। আর এই সুযোগে লাঠি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় ধূর্ত শেয়াল। এখন শুধু শিয়াল কুমিরের যুগ নয়। এখানে আছে ক্ষমতার ছায়া আর সহায়তা। কুমিরের বাচ্চার মতো জনগণের আমানত থাকে ব্যাংকে। সেখানে আছে ধূর্ত শিয়াল। এরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ

সহায়তা পেয়ে খেয়ে ফেলছে আমানতের টাকা। এস আলম কী শিয়ালের পা না লাঠি এই সন্দেহ যেমন আছে তেমনি লুটপাট যে হচ্ছে তার সত্যতাও আছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জন্য কত ভর্তুকি দিচ্ছে আর সে ভর্তুকি দিতে প্রধানমন্ত্রীর কত কষ্ট! সেইসব কথা প্রচার মাধ্যমগুলোয় ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। জনগণ দেখছে–জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের অসহ্য চাপে পিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা বাড়ানোর টাকা বরাদ্দ করতে কত কসরত করতে হয় আর ব্যাংকে রাখা আমানত থেকে হারিয়ে যায় হাজার হাজার কোটি টাকা!

এই লুটপাটের দায় কে বহন করবে? দায় তো বহন করবে সেই দুর্ভাগা জনগণ যাদের সংসার চালানো এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। ব্যাংকে টাকা রাখে সাধারণ মানুষ, সরকারের স্নেহ, সহায়তা পুষ্ট অসাধারণরা টাকা পাচার করে। আবার এরাই ব্যাংকের মালিক হয়, নীতিনির্ধারক হয়। এই দুর্বৃত্ত পোষণের রাজনীতির অবসান হবে কবে? সারা পৃথিবীর দৃষ্টান্ত এই যে, পুঁজিবাদী শোষণ রহাল রেখে এই দুনীতি আর লুটপাটের অবসান হবে না। এর জন্য প্রচলিত ব্যবস্থা বদল করতে হবে। জনগণের সম্পদের পাহারাদার জনগণকেই হতে হবে।